Volume: 3 Issue: 8 Pages: 157-163

উপন্যাসের আঙিনায়: চতুরঙ্গ

[*1] বনানী দোলই

[*1] সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জয়পুর পঞ্চানন রায় কলেজ, পোস্ট- জয়পুর-ফকিরদাস, আমতা-২, জেলা- হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Article Info.
E-ISSN: 2583-6528
Impact Factor (SJIF): 5.231
Peer Reviewed Journal
Available online:
www.alladvancejournal.com

Received: 25/July/2024
Accepted: 26/Aug/2024

***Corresponding Author**
বনানী দোলই
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জয়পুর পঞ্চানন রায় কলেজ, পোস্ট- জয়পুর-ফকিরদাস, আমতা-২, জেলা- হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract
রবীন্দ্রনাথের একটি ব্যতিক্রমী উপন্যাস চতুরঙ্গ। এই উপন্যাসের গঠনরীতি এবং বিষয়বস্তু উভয় ক্ষেত্রেই অভিনবত্ব লক্ষ্য করা যায়। উত্তম পুরুষের বয়ানে একটি ডায়ারি রচনা করেছে উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র শ্রীবিলাস। এই উপন্যাসের আয়তন ক্ষুদ্র, তবে বক্তব্য চিরকালীন। উপন্যাসের মূল চরিত্র চারটি। জ্যাঠামশায়, শচীশ, শ্রীবিলাস ও দামিনী- এই চারজনের ভাবনাচিন্তা, ক্রিয়াকর্ম প্রভৃতির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরবিশ্বাস, নাস্তিকতা, সমাজের বিধি-বিধান, প্রেম, প্রেমের প্রাপ্তি- অপ্রাপ্তি , জীবনের আরও নানা দিক যেমন সমাজসেবা, প্রভৃতি নানান বিষয়ের সামনে পাঠককে দাঁড় করিয়েছেন। চিন্তা ভাবনার দিগন্তে এসে মানুষের মনকে যেন স্বাধীন উন্মুক্ত করতে চেয়েছেন। ননীবালা ও দামিনী এই দুই চরিত্র উনিশ শতকের নারীর মানসিক বন্দীদশা এবং আগল খুলে বেরিয়ে পড়া- এই দুই অবস্থার যেন দুই প্রতিনিধি। নর- নারীর জীবনে প্রেম যে কী গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক তা এই উপন্যাসে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। চতুরঙ্গ উপন্যাস আকারে প্রকাশের আগে হয়ত রবীন্দ্রনাথের মনে ছোটোগল্প রূপে উপস্থাপিত হয়েছিল। ‘সবুজপত্র’ পত্রিকায় স্বতন্ত্র্য চারটি গল্পরূপে প্রকাশিত হয়েছিল। ভাষার দিকে খেয়াল করলে দেখা যায় সংক্ষিপ্ত ব্যঞ্জনাধর্মী নানা বাক্যবিন্যাস সেগুলি উপমা চিত্রকল্পে পরিপূর্ণ। এই উপন্যাসটির অবদান আপরিসীম। প্রকৃতির নানা উপাদান এই উপন্যাসে উপমারূপে ব্যাবহৃত হয়ে উপন্যাসটিকে প্রাণবন্ত করেছে। কীর্তন এবং আধুনিক কবির গান এই বিষয়টিও এই উপন্যাসের আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। বাঙালি জীবনের সমস্ত দিকগুলিই এই উপন্যাসে যেন ধরা পড়েছে।

Keywords: ব্যঞ্জনাধর্মী ব্যতিক্রমী উপন্যাস চতুরঙ্গ

Introduction

চতুরঙ্গ উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য একটি উপন্যাস, প্রকাশিত হয় ১৩২২ বঙ্গাব্দে, ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে. উপন্যাসটির বিশেষত্ব এই যে রচনার আঙ্গিকের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় উত্তম পুরুষের বয়ানে একটি চরিত্রের ডায়রি রচনার মাধ্যমে একটি পূর্ণাংগ উপন্যাস নির্মিত হয়েছে। গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২১ বঙ্গাব্দে ‘সবুজ পত্র’ পত্রিকায়। অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন পরপর চার মাসের চারটি সংখ্যায়, চারটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গল্পের চেহারায়। অগ্রহায়ণ মাসে ‘জ্যাঠামশায়’ এরপর পৌষে ‘শচীশ’, মাঘে ‘দামিনী’ এবং শেষ অধ্যায় ‘শ্রীবিলাস’ ফাল্গুন মাসে প্রকাশিত হয়। চতুরঙ্গের এই চারটি অধ্যায় প্রকাশিত হওয়ার আগে ‘সবুজ পত্র’ পত্রিকায় পরপর সাতটি ছোটোগল্প প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩২১ এর বৈশাখ থেকে কার্তিক পর্যন্ত সাতটি গল্প প্রকাশের পর ‘জ্যাঠামশায়’ নামে প্রকাশিত রচনাটিকে একটি স্বতন্ত্র গল্প হিসেবে ভাবতে কোনোই অসুবিধা ছিল না। পূর্ণাংগ একটি গল্পের সমস্ত বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে উপস্থিত ছিল। তবে পরের সংখ্যায় ‘শচীশ’ প্রকাশের পর একথা স্পষ্ট হয় যে জ্যাঠামশায় অধ্যায়টি ছিল সূচনা অংশ বা মুখবন্ধবিশেষ। একমাত্র ‘জ্যাঠামশায়’ অধ্যায়টিকেই স্বতন্ত্র্য গল্প বলা যেতে পারে, অন্যগুলি তার সূত্র ধরেই এগিয়েছে। উপন্যাসটির গঠন এরকম যে প্রতিটি অধ্যায়ের মধ্যে আবার এক, দুই, তিন, করে ছোট ছোট পরিচ্ছেদের ভাগ আছে। ‘জ্যাঠামশায়’ নামক অধ্যায়টির প্রথম পরিচ্ছেদে জ্যাঠামশায় চরিত্রটির কোন উপস্থিতি নেই। দ্বিতীয় পর্বে তাঁর উপস্থিতি। জগমোহন শচীশের জ্যাঠা, এইভাবে তাঁর পরিচয় ঘটে পাঠকের সঙ্গে। শচীশের প্রতি শ্রীবিলাসের মুগ্ধতা দিয়ে উপন্যাসের সূচনা। উপন্যাসের চারটি প্রধান চরিত্রের মধ্যে একটিমাত্র নারী চরিত্র দামিনীরও কোন উল্লেখ নেই। উপন্যাসটির অগ্রগতি যে শচীশকে কেন্দ্র করেই হবে একথা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না।

শচীশ ও শ্রীবিলাস

সমবয়সী দুই যুবক ।একজন জন্ম থেকেই শহরে বসবাস করে, এবং অন্যজন গ্রাম থেকে এসে উপস্থিত হয়। গ্রামীণ মানুষের কাছে শহর নানাভাবে আকর্ষণীয়। শচীশের রূপে প্রথম মোহাবিষ্ট হয়। শ্রীবিলাস শচীশের রূপের বর্ণনা দেয় এইভাবে 'শচীশকে দেখিলে মনে হয় যেন একটা জ্যোতিষ্ক – তার চোখ জ্বলিতেছে; তার লম্বা লম্বা আঙুলগুলি যেন আগুনের শিখা; তার গায়ের রং যেন রং নহে, তাহা আভা। শচীশকে যখন দেখিলাম অমনি যেন তার অন্তরাত্মাকে দেখিতে পাইলাম;- তাই একমুহূর্তে তাহাকে ভালবাসিলাম'। ১

শ্রীবিলাস বলেছে যেন সে শচীশের অন্তরাত্মাকে দেখতে পেয়েছে, তাই তাকে ভালোবেসেছে। প্রকৃতপক্ষে প্রথম দর্শনেই অন্তরাত্মার দেখা পাওয়া যায় না। তাই সংশয়বাচক যেন শব্দের ব্যবহার করেছে। শ্রীবিলাস প্রথম দর্শনে অবশ্যই শচীশের রূপে, ব্যাক্তিত্বে মুগ্ধ হয়েছে। উপন্যাসের এগিয়ে চলায় এই শচীশ চরিত্রের মাধ্যমে জীবনের চলার পথ, আদর্শ, আত্মানুসন্ধানের এক যাত্রায় পাঠক শ্রীবিলাসের সঙ্গে এগিয়ে চলে। এই উপন্যাসের প্রধান চারটি চরিত্রের মধ্যে শ্রীবিলাসের চোখ দিয়েই আমরা অন্য চরিত্রগুলিকে দেখি। যেহেতু সেই গল্পের কথক তার চরিত্র পাঠককে নিজেকেই বুঝে নিতে হয়। অন্য দুটি চরিত্রের মধ্যে জ্যাঠামশায় এবং দামিনী এদের ভূমিকা শচীশের জীবনে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'জ্যাঠামশায়' অধ্যায়টি এই উপন্যাসের ভিত্তিভূমি, আর জ্যাঠামশায় শচীশের জীবনের ভিত গড়ে দিয়েছিলেন। উপন্যাসটির নাম চতুরঙ্গ। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে চতুরঙ্গ উপন্যাস সম্পর্কে যে স্মৃতিচারণ করেছেন এইভাবে যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নতুন রচনা পাঠের আসরে চতুরঙ্গের অধ্যায়গুলি পাঠ করলেন, তখনও এর নামকরণ হয় নি। রবীন্দ্রনাথ পাঠ করে শুনিয়েছিলেন 'শ্রীবিলাস' অধ্যায়টি। আগের তিনটি অধ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

''গল্পটাতে শিলাইদায়ের গন্ধ খুব। সেখানকার ভাঙা নীলকুঠি, বালির চর প্রভৃতি বর্ণনা চমৎকার। সকলের এই গল্পটা বিশেষভাবে ভালো লাগল বলে বোধ হল। এই চারটি গল্পের কী নামকরণ হবে তা নিয়েও আলোচনা হল। 'চারজনা', 'চতুষ্টয়', 'চতুষ্কোণ', 'শচীশ', 'দামিনী', 'শ্রীবিলাস' প্রভৃতি অনেক রকম suggested হল। শেষটা – 'চতুরঙ্গ' কে বলাতে সকলের একবাক্যে পছন্দ হল- বাবারও এটা একবার আগে মনে হয়েছিল''। ২

চতুরঙ্গ এই নামটি সার্থক। ব্যাঞ্জনাধর্মী এই উপন্যাসে কথার থেকে ইঙ্গিত বেশি। ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ নতুন এক আঙ্গিকে এই উপন্যাসের নির্মাণ করেছেন। শচীশের জীবনে স্পষ্টতই চারটি অঙ্গ আছে। জ্যাঠামশায়, লীলানন্দস্বামী, দামিনী এবং শচীশের একক আত্মানুসন্ধান। শচীশের প্রথম জীবন জ্যাঠামশায়ের আদর্শে গঠিত। শ্রীবিলাস উপন্যাসের একদম সূচনাতেই বলেছে শচীশের সহপাঠীরা শচীশকে পছন্দ করে না। সে সকলের মতো না। দশের থেকে পৃথক। সে সাধারণের মতো ঈশ্বরে বিশ্বাসী নয়। সে নিজেকে নাস্তিক বলে ঘোষণা করতে দ্বিধাবোধ করত না। শচীশের জ্যাঠা জগমোহন ছিলেন তখনকার দিনের নামজাদা নাস্তিক। শচীশ তাঁর আশ্রয়ে বড়ো হচ্ছিল। জগমোহন তাঁর নাস্তিকধর্ম পালনের ক্ষেত্রে যে বিষয়টিতে প্রাধান্য দিয়েছিলেন তা হল 'প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখসাধন' করা। এই ভালো করা বা সুখসাধনের বিনিময়ে তিনি কোন পুণ্য, পুরস্কার, বকশিস কিছুই আশা করতেন না। শচীশের জন্মদাতা পিতা হরিমোহন হলেও সর্ব অর্থে তার পিতার স্থানে ছিলেন জগমোহন। জগমোহনের শিক্ষায় শচীশ এই তত্ত্ব অনুসরণ করত যে তাঁরা অন্য কিছু মানেন না তাই নিজেকে মানতে হবে, যার ব্যাপকার্থ এই যে সত্যকে সর্বদা স্বীকার করে চলতে হবে। তাই শ্রীবিলাস যখন জানতে চায় শচীশ নাস্তিক কিনা, তার স্বীকার করতে কোন অসুবিধা হয় না। আমরা দেখি শচীশ না হয় জন্মাবধি জগমোহনের অনুসারী, কিন্তু শ্রীবিলাস গ্রাম থেকে এসে প্রথমে শচীশ নাস্তিক একথা জেনে প্রবল আঘাত পেয়েও সোনার-বেনে শচীশ মল্লিকের তথা জগমোহন মল্লিকের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। 'কেহ কোনোদিন মনে করিতে পারিত না আমি কোনো জন্মে সোনার –বেনের সঙ্গে একসঙ্গে আহার করিব এবং নাস্তিক্যে আমার গোঁড়ামি আমার গুরুকে ছাড়াইয়া উঠিবে,-ক্রমে আমার ভাগ্যে তা-ও ঘটিল'.৩

শ্রীবিলাস দেখেছিল শচীশের মুখের মধ্যে জ্যোতি, অন্তরে যেন পূজার প্রদীপ জ্বলছে। শচীশ টানা আঠারো বছর জগমোহনের ছায়ায় থাকার পর, তার পিতা ও জ্যাঠার বিবাদে জগমোহন শচীশকে বিদায় জানাতে একপ্রকার বাধ্য হলেন। শচীশ বন্ধুর মেসে উঠল, প্রাইভেট টিউশনি করে দিনযাপন করল। শচীশ আবার জগমোহনের মুখোমুখি হল ননিবালাকে সঙ্গে নিয়ে। বিধবা গর্ভবতী ননিবালাকে নিজের দাদা নরাধম পুরন্দরের হাত থেকে রক্ষা করতে জগমোহনের আশ্রয়ে রেখে গেল। শচীশ কুলের কলঙ্ক মোছার জন্য ননিবালাকে বিয়ে করতেও শচীশ প্রস্তুত ছিল। এই হিতসাধনে তথা বিবাহে ননিবালার মতামত কেউ চাইল না। তাই শেষ পর্যন্ত ননিবালা এই বিবাহ নিরস্ত করল, নিজে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে। ননিবালার বিদায় অবশ্যই দুঃখের কিন্তু এই পৃথিবীর তাতে কারও কোন ক্ষতি হল না। 'শচীশ' অধ্যায়ে শচীশের ডায়রিতে শচীশের বয়ানে এটুকু জানা যায় যে, শচীশ ননিবালার মধ্যে নারীর এক বিশ্বরূপ দেখেছে, যেখানে পাপিষ্ঠের জন্য জীবন বিসর্জন দিয়ে সে নারী জীবনের সুধাপাত্র পূর্ণ করেছে। শচীশ তার ডায়রিতে যেভাবে ননিবালা আর দামিনী সম্পর্কে আলোচনা করেছে, তাতে একথা ভাবতে ইচ্ছে করে যে শচীশের ভাবনাচিন্তা যথেষ্ট গভীর, স্বচ্ছ, পরিণত। দামিনীর সম্পর্কে শচীশ বলেছে,

'সে নারী মৃত্যুর কেহ নয়, সে জীবনরসের রসিক। বসন্তের পুষ্পবনের মতো লাবন্যে গন্ধে হিল্লোলে সে কেবলই ভরপুর হইয়া উঠিতেছে ; সে কিছুই ফেলিতে চায় না, সে সন্ন্যাসীকে ঘরে স্থান দিতে নারাজ, সে উত্তুরে হাওয়াকে সিকি-পয়সা খাজনা দিবে না পণ করিয়া বসিয়া আছে'।৪

এ ভাবনা এই পর্যবেক্ষণ শচীশের! নাকি রবীন্দ্রনাথের! ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ শচীশকে আড়াল করে নিজেই এখানে উদ্ভাসিত হয়েছেন। ননিবালাকে কুলের কলঙ্ক থেকে উদ্ধার করতে শচীশ বিয়ে করতে প্রস্তুত ছিল, অথচ দামিনীর ভালোবাসাকে কিছুতেই গ্রহণ করতে পারল না। তাকে এতটা বুঝেও গ্রহণ করতে পারল না। সত্যিই সে বুঝেছিল, নাকি রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, এ প্রশ্ন মনে থেকে যায়। হরিমোহনের জ্যেষ্ঠ সন্তান পুরন্দরের কারণে ননিবালার এই পৃথিবীতে থাকা হয় না, কনিষ্ঠ সন্তান শচীশ আর এক রমণী দামিনীর মৃত্যুর কারণ হয়। 'শচীশ' অধ্যায়ের শেষে আমরা পেয়েছি সমুদ্রের ধারে গুহায় দামিনীর আগমন এবং শচীশের পদাঘাত যা দামিনী যৌতুক বলে গ্রহণ করেছিল। জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পর শচীশের খোঁজ পাওয়া গেল দুবছর পর। জ্যাঠামশায় মারা যাওয়ার পর শচীশের জীবন শূন্য হয়ে গেল। এই ভয়ানক শূন্যতার সঙ্গে কলকাতায় বসবাস করা তার পক্ষে সহজ হল না। জ্যাঠামশায়ের শিক্ষায় এখানেই অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে। জ্যাঠামশায় শচীশের পিতা, বন্ধু, শিক্ষক ছিলেন। তাঁকে নানাভাবে রক্ষা করা শচীশের দায়িত্ব ছিল। তাঁর অবর্তমানে বন্ধু শ্রীবিলাস এবং তার অন্য সঙ্গীদের সাহচর্যে সে জীবন কাটাতে পারে নি। শোককে স্থিতধী চিত্তে শচীশ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়। শ্রীবিলাস সঙ্গীসাথীদের নিয়ে মানুষের ধর্মকর্মে বিঘ্ন

ঘটানোর কাজ চালিয়ে যেতে থাকে, তবে শচীশবিহীন সেই দল কাঁটার মতো হয়ে উঠল। শচীশ চঞ্চল, শ্রীবিলাস স্থিরমতি। শচীশ ছিল তাদের দলের ফুল, শচীশের প্রতি শ্রীবিলাসের ছিল অগাধ ভালোবাসা। সে শচীশের সন্ধান ত্যাগ করতে পারে নি। দুবছর পরে শচীশকে পাওয়া গেল চাটগাঁয়ে লীলানন্দ স্বামীর সঙ্গে কীর্তনে মেতে আছে। জগমোহনের শিষ্য শচীশ কীভাবে লীলানন্দ স্বামীর আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে তা ব্যাখ্যাতীত। শ্রীবিলাস শচীশের কাছে জানতে চায় জ্যাঠামশায়ের মৃত্যু কি সত্যি এতবড়ো মৃত্যু যে এই বন্ধনের পথ ধরতে হবে! শচীশ তার এই আশ্রয়গ্রহণটুকু জ্যাঠামশায়ের কাণ্ড বলে চালিয়ে দিতে চেয়েছে। দিনের বেলাকার মুক্তি, রাতের বেলাকার মুক্তি এভাবে কাজের ক্ষেত্র আর রসের সমুদ্রকে আলাদা করেছে। শ্রীবিলাস শচীশের এই ব্যাখ্যাকে একেবারেই অন্তর থেকে গ্রহণ করে না। শ্রীবিলাস যুক্তি দিয়ে জীবনকে দেখে, তাই শচীশের মতের সঙ্গে একমত হতে পারে না। শচীশ একথা উপলব্ধি করতে পারে নি, যে তাদের লীলানন্দ স্বামীকে যতটা দরকার,তার থেকেও তাদেরকেই লীলানন্দ স্বামীর বেশি দরকার। ইংরাজি শিক্ষিত বৃত্তি পাওয়া একদা নাস্তিক, শিষ্য থাকলে গুরুর মূল্য বাড়ে বেশি। শ্রীবিলাস এভাবেই নিজের কথা বলে, যুক্তির কথা বলে। ভাবের কথা বলে না। 'আমি তো ভেদজ্ঞানবিলুপ্ত একাকারতা-বন্যার একটা ঢেউমাত্র হইতে চাই না- আমি যে আমি'।৫

শ্রীবিলাস এত সচেতনভাবে নিজেকে উপলব্ধি করা সত্ত্বেও ভালবাসার কাছে হার স্বীকার করেছে। শচীশের টানে একদিন নাস্তিক হয়েছিল, শচীশের টানে লীলানন্দ স্বামীর সঙ্গে রসের স্রোতে ভাসল। গ্রাম থেকে তারা এল শহরে। শহরে এসে শ্রীবিলাসের রসের নেশা বজায় রাখা আর সম্ভব হল না, শচীশের কাছে যেন কলকাতা শহরের আলাদা কোন অস্তিত্বই রইল না। কলকাতা শহরে লীলানন্দ স্বামীর সূত্র ধরে শচীশ ও শ্রীবিলাস দামিনীর সংস্পর্শে এল। দামিনী গুরুর আশ্রয়ে থাকতে বাধ্য ছিল, কারণ তার স্বামী শিবতোষ সমস্ত সম্পত্তিসমেত তাকে গুরুর হাতে সমর্পণ করে গিয়েছিল। বিধবা দামিনী বিবাহিত থাকা অবস্থাতে কখনও প্রভুর কাছে নত হতে চায় নি, বিধবা হয়েও গুরুর প্রতি তার মনোভাব বিন্দুমাত্র পরিবর্তিত হয় নি। গুরুর কানে তার সমস্ত ব্যাঙ্গবিদ্রূপ পৌঁছচ্ছে জেনেও সে তা বন্ধ করত না। তার আচারণ বেশভূষা বিধবার মতো ছিল না। তারা আসার পরও কিছুদিন দামিনীর এমন বিদ্রোহী মনোভাব ছিল। আমরা জানি শ্রীবিলাস প্রথম দর্শনেই শচীশকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিল, ভালবেসেছিল। জীবনরসের রসিক দামিনী শচীশকে দেখে মুগ্ধ হলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। শচীশের ঘরে লীলানন্দ স্বামীর ভাঙা মূর্তি পাওয়া গেল। একদিন শচীশ শীতের দুপুরে হঠাৎ আবিষ্কার করল তার ঘরের চৌকাঠে মাথা ঠুকছে, শচীশ ভয় পেয়ে ছুটে চলে যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'রসের ধর্ম' প্রবন্ধে বলেছেন 'এই রসটি যেখানে শুকিয়ে যায় সেখানে আবার সেই নিশ্চল কঠিনতা বেরিয়ে পড়ে, সেখানে প্রাণের ও যৌবনের নমনীয়তা কমনীয়তা চলে যায়, জরা ও মৃত্যুর যে-আড়ষ্টতা তাই উৎকট হয়ে ওঠে। আমাদের ধর্মসাধনার মধ্যেও রসময় গতিতত্ত্বটি না রাখলে তার সম্পূর্ণতা নেই, এমনকি, তার যেটি চরম সার্থকতা সেইটিই নষ্ট হয়। অনেকসময় ধর্মসাধনায় দেখা যায়, কঠিনতাই প্রবল হয়ে ওঠে- তার অবিচলিত দৃঢ়তা নিষ্ঠুর শুষ্কভাবেই আপনাকে প্রকাশ করে। সে আপনার সীমার মধ্যে অত্যন্ত উদ্ধত হয়ে বসে থাকে; সে অন্যকে আঘাত করে। তার মধ্যে কোনোপ্রকার নড়াচড়া নেই, এইটে নিয়ে সে গৌরব বোধ করে; .....এই কাঠিন্য মাধুর্যকে দুর্বলতা এবং বৈচিত্র্যকে মায়ার ইন্দ্রজাল বলে অবজ্ঞা করে এবং সমস্তকে সবলে একাকার করে দেওয়াকেই সমন্বয় সাধন বলে মনে করে'.৬

শচীশের চরিত্রের মধ্যে কাঠিন্য ছিল অতিরিক্ত মাত্রায়। সে নিজের ভাবনার বাইরে আর বেরোতে পারে নি।দামিনীর প্রেম তার মনকে কিছুতেই স্পর্শ করতে পারে না। গুহায় দামিনীর আগমন সে কি একেবারেই বুঝতে পারে নি! দামিনীর উপযাজিকা হয়ে শচীশের কাছে যাওয়া এবং শচীশের পদাঘাত দামিনীর জীবনে পরিবর্তন নিয়ে এল। শ্রীবিলাস সব জানল না ঠিকই তবে ক্রমাগত বেদনার্ত হল। ব্যথায় তার মন টনটন করে উঠত, রসের লীলায় ভঙ্গ দিয়ে সে নিজের জীবনে ফিরে গেলে যেন শান্তি পাবে, একথাই তার মনে হতে লাগল। শচীশ মুক্তির সন্ধানে একাগ্র হয়ে থাকল। সে বন্ধনহীন মুক্তির প্রার্থনা করতে থাকল। অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় মুক্তির আস্বাদ শচীশ চায় নি। দামিনীকে নিয়ে সে যে ভিতরে বাইরে অস্থির হয় নি তা নয়, দামিনী গুহা থেকে ফিরে আসার পর আবার গুরুর সঙ্গে দূরত্ব রাখতে শুরু করলে শচীশ অস্থির হয়ে ওঠে। শচীশ লীলানন্দ স্বামীকেও ত্যাগ করে। শেষ পর্যন্ত দামিনীকে অনুরোধ করে যে দামিনী যেন তাকে ত্যাগ করে। শচীশ মানবজীবনের স্বাভাবিক চাহিদাকে অস্বীকার করে, নারীকে দূরে রেখে সে সাধনায় মগ্ন থাকতে চায়। শ্রীবিলাস শচীশের নানারূপ দেখে বিস্মিত হয়, কিছুক্ষণ তর্ক করে চুপ করে যায়। শ্রীবিলাস বোঝে দামিনী আর শচীশের মাঝে পড়ে তার অবস্থা শোচনীয়। দামিনী শ্রীবিলাসকে নিজের প্রয়োজনে ইচ্ছেমতো ব্যাবহার করে। বিশেষত শচীশের মনে ঈর্ষা জাগানোর জন্য দামিনী দৈনন্দিন জীবনের নানা কর্ম প্রবাহে শচীশের সামনে শ্রীবিলাসকে সঙ্গী করেছে। শ্রীবিলাস নিঃশর্তভাবে প্রতিদানের কোন আশা না করে প্রথমে শচীশকে পরে দামিনীকেও ভালবেসে গেছে। শেষ পর্যন্ত শ্রীবিলাস নিঃসঙ্গ, একা। দামিনী একদম শেষের দিকে শ্রীবিলাসের দিকে তাকানোর সময় পেয়েছিল।

'আমি যে একটা কিছু, দামিনী এতদিন সে-কথা লক্ষ করিবার সময় পায় নাই, বোধ করি আর কোনো দিক হইতে তার চোখে বেশি আলো পড়িয়াছিল। এবারে তার সমস্ত জগৎ সংকীর্ণ হইয়া সেইটুকুতে আসিয়া ঠেকিল যেখানে আমিই কেবল একলা। কাজেই আমাকে সম্পূর্ণ চোখ মেলিয়া দেখা ছাড়া আর উপায় ছিল না। আমার ভাগ্য ভালো,তাই ঠিক এই সময়টাতে দামিনী আমাকে যেন প্রথম দেখিল'।৭

দামিনী জন্মান্তরে শ্রীবিলাসকে চেয়েছে। এই তার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ প্রাপ্তি। পাড়াগাঁ থেকে কলকাতা শহরে এসে কর্মসাধনা, ধর্মসাধনা, প্রেমে অপ্রাপ্তির দহন, এইসব প্রত্যক্ষ করে, এগুলিতে অনেকাংশে তার অংশগ্রণ থাকে, তবে পাঠক উপলব্ধি করতে পারে, সচল গতিসম্পন্ন মানুষ আসলে শ্রীবিলাস। শচীশ পার্থিবকে অস্বীকার করতে চায়, শ্রীবিলাস পার্থিবকে সঙ্গে নিয়ে পথ চলতে চায়। শ্রীবিলাসের সাধনাই কঠিন। তবে এই কঠিন সাধনার মাধ্যমে সত্যে উপনীত হওয়া যায়। আদর্শের চাহিদা পূরণের থেকে মানুষের চাহিদার প্রাধান্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাঞ্জনাধর্মী এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ কাহিনিতে শচীশের উপর আলোদান করতে করতে এগিয়েছেন, তবে শেষ পর্যন্ত সব আলোটুকু শ্রীবিলাসেরই প্রাপ্তি হয়। শ্রীবিলাসের সঙ্গেই পাঠক একাত্ম হতে পারে। এই উপন্যাস শ্রীবিলাসের।

দামিনী

চতুরঙ্গ উপন্যাসের নারী চরিত্র দামিনী। 'শচীশ' অধ্যায়ের মাঝামাঝি অংশে দামিনীর আবির্ভাব।লীলানন্দ স্বামীর পরম ভক্ত শিবতোষের বাড়ি কলকাতায়। এখানে এসেই দামিনীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। দামিনীর প্রথম পরিচয় এভাবেই শ্রীবিলাস দিয়েছে যেন সে অনাবৃষ্টির মধ্যে ঝরঝর করে হয়ে যাওয়া বৃষ্টির মতো। শিবতোষ মৃত্যুর আগে দামিনীকে সম্পত্তিসমেত

গুরুর হাতে দিয়ে গিয়েছিল। দামিনী কখনই গুরুমাহাত্ম্যে বশীভূত হয় নি। শিবতোষ সেই কারণে শাস্তিস্বরূপ গুরুর কাছে তাকে সমর্পণ করে। ভক্তের দস্যুবৃত্তি দামিনী জীবনে উপলব্ধি করতে বাধ্য হয়েছে। তার পিতৃগৃহে যখন অনাহারে সবাই দিন কাটাচ্ছে তখন তাকে প্রতিদিন ষাট সত্তর জন ভক্তের সেবার অন্ন রান্না করতে হয়েছে। ভক্তিমার্গের অসারতা সে জানত, তাই সে ভক্তির সমুদ্রে আশ্রয় নিতে পারে নি, কত মানুষ দূর দূরান্ত থেকে গুরুর আশ্রয় নিতে এসেছে, দামিনী বিনা চেষ্টায় আসতে পারত, কিন্তু এই দুর্লভ সৌভাগ্যকে সে অপমান করে দূরে সরিয়ে রেখেছ। দামিনী ভাবজগতে বাঁচতে চায় না। সে ব্যাক্তিত্বময়ী, সে প্রকৃতপক্ষেই জীবনরসের রসিক, দামিনী বসন্তের পুষ্পবনের মতো লাবণ্যে গন্ধে হিল্লোলে নিজেকে পরিপূর্ণ করে রাখতে চায়। এর মধ্যে অস্বাভিকতা কিছুই নেই। গুরু উপদেশ দিতে ডাকলে তার মাথা ধরে, সে থিয়েটার দেখতে চায়, তার বেশভূষা বিধবার মতো নয়। গুরুকে নানাভাবে উপেক্ষা করে দাপটের সঙ্গেই বেঁচেছিল দামিনী। বিদ্রোহিণী রমণীর জীবনে শচীশ নিয়ে এল ঝড়। গুরু ভাবতের একদিন অঘটন ঘটবে, অর্থাৎ দামিনী নত হবে। দামিনী নত হল, তবে তা কেবলই শচীশের জন্য।

'বিদ্রোহের কর্কশ আবরণটা কোন ভোরের আলোতে নিঃশব্দে একেবারে চৌচির হইয়া ফাটিয়া গেল, আত্মোৎসর্গের ফুলটি উপরের দিকে শিশিরভরা মুখটি তুলিয়া ধরিল। দামিনীর সেবা এখন এমন সহজে এমন সুন্দর হইয়া উঠিল যে, তার মাধুর্যে ভক্তদের সাধনার উপরে ভক্তবৎসলের যেন বিশেষ একটি বর আসিয়া পৌঁছল। এমনি করিয়া দামিনী যখন স্থির সৌদামিনী হইয়া উঠিয়াছে শচীশ তার শোভা দেখিতে লাগিল।কিন্তু আমি বলিতেছি শচীশ কেবল শোভাই দেখিল, দামিনীকে দেখিল না'।৮

শচীশ এবং গুরুজী দুজনের কেউই দামিনীকে দেখতে পান নি, দেখতে চানও নি হয়তোবা। দামিনী যখন দুর্গম নির্জন জায়গায় বেড়াতে গেলেন দামিনী কিছুতেই সঙ্গ ছাড়ল না। লীলানন্দ স্বামী ভাবলেন ভক্তি। দামিনী গেল শচীশের টানে। গুহা থেকে শচীশের আঘাত নিয়ে দামিনী ফিরল। দামিনী আবার সরে এল। সে বুঝল আঘাত ছাড়া পাওয়ার কিছু নেই। শচীশের পদাঘাত তো শুধু তার দেহে নয়, মনেও লেগেছিল। দামিনী পাড়ায় মেয়েদের সঙ্গে ভাব করে আবার তার আগের জীবনে ফিরতে লাগল। লীলানন্দ স্বামী ভাবলেন দামিনীর মাটির দিকেই টান, আকাশের দিকে নয়। রবীন্দ্রনাথ ১৩২১ বঙ্গাব্দে একটি গান লিখেছিলেন – এই যে কালো মাটির বাসা শ্যামল সুখের ধরা – এ গান যেন দামিনীর জন্যই লেখা। দামিনী দূরে সরে এলেও হৃদয় তার শচীশের জন্যই নিবেদিত। বিরহী তোর সেইখানে যে একলা বসে থাকে—হৃদয় তাহার ক্ষণে ক্ষণে নামটি তোমার ডাকে – দামিনীর বিরহী হৃদয় মাটির দিকেই ফিরতে চায়। রসের চর্চা ত্যাগ করে দামিনী কুকুরের বেজির চিলের সেবা করতে লাগল, ভাঙা হাঁড়িতে ফুলগাছের চর্চা করতে লাগল। দামিনী জানে এখানে তার আঘাত পাওয়ার নেই। পরিবর্তে নিজস্ব আনন্দ আছে। শচীশ বরং আবার তাকে ডাক দিতে লাগল। দামিনী শচীশকে প্রকাশ্যে বলল যে তার আশা ছাড়াই ভাল। রসের চর্চা না করেই সে পূর্বে ভালো ছিল, আবারও ভালো থাকবে। তবে দামিনী নারীর অন্তঃদৃষ্টি দিয়ে একথা বুঝেছিল যে তার এই দূরে সরে থাকায় শচীশ অস্থির হয়ে উঠছে, শচীশ স্থির থাকতে পারছে না। এই বিষয়টাতে আরও ইন্ধন জোগাতে শুরু করল দামিনী। দামিনী গুরুজির কাছে ঘেঁসে না রাগে, শচীশকে এড়িয়ে চলে অনুরাগে। শ্রীবিলাসের প্রতি রাগ অনুরাগ না থাকায় শ্রীবিলাসকে নিজের কাজে ব্যাবহার করতে তার অসুবিধা হয় নি। শচীশ পুড়তে লাগল। শচীশের দহন দামিনী উপভোগ করল। লীলানন্দ স্বামী দামিনীকে ভয় পেয়েছেন, শ্রীবিলাস দামিনীকে স্বীকার করেছে তার ভাল মন্দ দুইকেই সে গ্রহণ করেছে, শচীশ দামিনীকে দগ্ধ করেছে, নিঃশেষ করতে পারে নি। প্রাণের নিঃশেষ আর মনের নিঃশেষ এক নয়। তাই দামিনী অনুরাগিণী কিন্তু স্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর। দামিনীর সরে থাকায় অস্থির শচীশ তার কাছে জানতে চায়, কেন সে এই ভক্তদের মধ্যে আছে যদি তার প্রয়োজন নাই থাকে গুরুকে-- 'শচীশ কহিল, তবে কেন তুমি এই ভক্তদের মধ্যে আছ? দামিনীর দুই চোখ যেন দপ করিয়া জ্বলিল; সে কহিল, কেন আছি? আমি কি সাধ করিয়া আছি? তোমাদের ভক্তরা যে ভক্তিহীনাকে ভক্তির গারদে পায়ে বেড়ি দিয়া রাখিয়াছে। তোমরা কি আমার আর-কোনো রাস্তা রাখিয়াছ?

শচীশ বলিল, আমরা ঠিক করিয়াছি, তুমি যদি কোনো আত্মীয়ার কাছে গিয়া থাকো তবে আমরা খরচপত্রের বন্দোবস্ত করিয়া দিব।

তোমরা ঠিক করিয়াছ?
আমি ঠিক করি নাই'।৯

রবীন্দ্রনাথ যখন এই উপন্যাস রচনা করছেন তখন বিশ শতকে আমরা উপনীত হয়েছি ঠিকই কিন্তু নারীদের নিজের কথা প্রকাশ করার ব্যাক্তিত্ব কম জনেরই ছিল। দামিনী সেই ব্যাতিক্রমীদের একজন যে নিজেকে পুরুষতন্ত্রের দশ-পঁচিশের ঘুটি হতে দিতে চায় না। সবটাই যে সে পেরেছিল তা নয়, তার স্বামীর সঙ্গে পুরোটা সে পেরে ওঠে নি, এরপর তাকে দিয়ে জোর করে লীলানন্দ স্বামী কিছুই করাতে পারেন নি। তাই দামিনীর জীবনে আমি অর্থাৎ নিজের কথা প্রাধান্য পায়। ভালোবেসে শচীশের জন্য সে অনেক কষ্ট সহ্য করেছে, ভালোবাসার ধর্মই তাই। এই উপন্যাসে আর যে কয়েকটি নারী চরিত্রের উপস্থিতি আছে সেখানে ননীবালাকে পুরন্দর মাঝরাতে লাথি মেরে বের করে দিয়েছিল। সেই পুরন্দরকেই সে ভুলতে পারে নি বলে শচীশকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত থেকে সরে যায়। নবীনের স্ত্রী নিজের স্বামী ও বোনের পরস্পরের প্রতি আসক্তি দেখে তাদের বিবাহ দিয়ে নিজেই আত্মহত্যা করে। দামিনী শচীশের প্রত্যাখ্যানে আত্মহত্যা করে নি। নবীনের স্ত্রীর আত্মহত্যা তাদের নিষ্ঠুর সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করায়। নির্লজ্জ নিষ্ঠুর সর্বনেশে রসের হাত থেকে মানুষকে বাঁচানোর উপায় জানতে চায় দামিনী। শচীশ লীলানন্দ স্বামীকে ত্যাগ করে। শচীশ তার সাধনায় শেষ পর্যন্ত কিসের সন্ধান পেয়েছিল আমাদের অজানা, দামিনী কিন্তু তাকে বলেছিল তার দেবতাকে যেন শচীশ না মজায়। দামিনীর ধারণা স্বচ্ছ ছিল, দামিনী যাকে ভালবেসেছিল তাকেই মানতে চেয়েছে। 'শ্রীবিলাস' অধ্যায়ে দামিনী আর শচীশের টানাপোড়েন চলেছে, শেষ পর্যন্ত দামিনী আবার জীবনের দিকে তাকাতে পেরেছে। শ্রীবিলাসকে সে প্রত্যাখান করে নি। মাসীর বাড়িতে স্থান হল না, ভাইদের কাছে সে নিজেই গেল না, পুরনো চেনা আশ্রয় লীলানন্দ স্বামীর কাছে ফিরে যেতে চাইলে শ্রীবিলাস তাকে সেই দিক থেকে ফিরিয়ে আনে। দামিনী নতুন করে শুরু করার সিদ্ধান্ত নিতে পারল। ভাগ্যের পরিহাসে তার আর শ্রীবিলাসের বিবাহিত জীবন দীর্ঘস্থায়ী হল না। ক্ষণস্থায়ী বিবাহিত জীবন এবং কয়েক বছরের সামগ্রিক চেনায় শ্রীবিলাস দামিনীকে এভাবেই উপস্থাপন করে, সে সত্য, সে শেষ পর্যন্ত দামিনী।

চতুরঙ্গ উপন্যাসে গানের প্রসঙ্গ

এই উপন্যাসের শচীশ অধ্যায়ের তিন পর্বে দু বছর যাবত নিরুদ্দেশ থাকা শচীশ সম্পর্কে শ্রীবিলাস বলে যে-সুরে শচীশ বাঁধা ছিল এই নাড়া খাইয়া তাহা নামিয়া গেছে। অর্থাৎ তানপুরা বা অন্য তারযন্ত্রের সুর বাঁধা থাকলেও তা নেমে যায়, পরিবেশের কারণে, শচীশের জীবনের সুর জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর ঘায়ে নাড়া খেয়ে নেমে গেছে। এই তিন পর্বেই পাওয়া যায় লীলানন্দ স্বামীর সঙ্গে কীর্তনে মাতিয়া করতাল বাজাইয়া পাড়া অস্থির করিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে।

শচীশের সন্ধানে অনেক পথ পার হয়ে যখন তাকে শিষ্য বাড়িতে পেল সেখানেও লোকে লোকারণ্য সমস্ত সকাল কীর্তন হইয়া গেছে। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর আবার বিকাল পাঁচটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত কীর্তন চলল। আজন্ম নাস্তিক শচীশের পরিবর্তিত জীবনে কীর্তনের ভূমিকা প্রবল। সে লীলানন্দ স্বামীর সঙ্গে কীর্তনের আবেশে আবিষ্ট হয়ে রসতত্ত্বে মগ্ন হয়ে থাকত। শচীশ অধ্যায়ের শেষ দিকে নয় পর্বে চারজনে একত্রে গেছেন ভ্রমণে, সমুদ্রের ধারে। অন্যবার দামিনী এই সময় মাসির বাড়িতে যেত।সারা বছর এই ছুটির জন্য সে উন্মুখ হয়ে থাকত। এবার তাদের সঙ্গে এসেছে। লীলানন্দ স্বামী ভেবেছেন, ভগবানের রসের রসায়নে পাথর নবনী হয়েছে। তাঁর বোঝা সম্পূর্ণ ভুল। সারাদিন ভ্রমণের পর সূর্যাস্তের সময় লীলানন্দ স্বামী আধুনিক কবির গান ধরলেন। আধুনিক কবির গান তাঁর চলে, এমন বলা হলেও একটি ছাড়া আর অন্য গানের উল্লেখ উপন্যাসে নেই।

পথে যেতে তোমার সাথে
মিলন হল দিনের শেষে।
দেখতে গিয়ে, সাঁঝের আলো
মিলিয়ে গেল এক নিমেষে।

সেদিনের এই গানে দামিনীর চোখ দিয়ে জল ঝরল। গুরুজি গানের অন্তরায় গেলেন। গানের বাকি অংশের সঙ্গে দামিনীর জীবন যেন একাত্ম হয়ে গেল।

দেখা তোমায় হোক বা না হোক
তাহার লাগি করব না শোক,
ক্ষণেক তুমি দাঁড়াও, তোমার
চরণ ঢাকি এলোকেশে।

দামিনী এই গানের কথায় সুরে মগ্ন হয়ে গুরুজিকে প্রণাম করল। দামিনীর সমর্পণের সুর খুব তাড়াতাড়ি কেটে গেল। শচীশ অধ্যায়ের শেষে গুহার সেই আঘাতে প্রত্যাখ্যানে দামিনী দূরত্ব রাখতে শুরু করল। গুরুজি দামিনীকে ভয় করতে শুরু করলেন। দামিনী অধ্যায়ের প্রথম পর্বে দেখা যায় আবারও কীর্তনের প্রসঙ্গ আবার গুরুজি গানে কীর্তনে বেশি করিয়া মন দিলেন। ভাবিলেন, মিষ্টগন্ধে উড়ো ভ্রমরটা আপনি ফিরিয়া আসিয়া মধুকোষের উপর স্থির হইয়া বসিবে। হেমন্তের ছোটো ছোটো দিনগুলো গানের মদে ফেনাইয়া যেন উপচিয়া পড়িল। গুরুজি দামিনীর মনকে বশ করতে কীর্তনে মন দিলেন। শচীশ নিজের মনকে বশ করতে আরও বেশি করে কীর্তনে মন দিল। শেষ পর্যন্ত নিজের মনকে বশ করতে না পেরে শ্রীবিলাসকে বলে যে দামিনীকে তাদের মধ্যে রাখা চলবে না, প্রকৃতির সংসর্গ ত্যাগ করতে হবে। 'দামিনী' অধ্যায়ে দামিনী ও শচীশের সম্পর্কের টানাপড়েনে একাধিকবার কীর্তনের প্রসঙ্গ এসেছে। পাড়ার গোবিন্দজির মন্দিরে নামজাদা কীর্তনের দল এসেছে। পালা শেষ হওয়ার আগেই শ্রীবিলাস উঠে আসে, রাত হবে পালা শেষ হতে। দামিনী কীর্তন শুনতে যায় নি। সেদিনের সন্ধ্যায় দামিনী মন খুলে যখন শ্রীবিলাসের কাছে নিজের কথা বলছে, উপস্থিত হল শচীশ।

শচীশ যখন আসিল তখনো নিশ্চয়ই কীর্তনের পালা শেষ হইতে অনেক দেরি ছিল।বুঝিলাম, ভিতরে এতক্ষণ তাকে কেবলই ঠেলা দিয়েছে। দামিনী অধ্যায়ের তিন পর্বে এই টানাপোড়েনে কীর্তনের প্রসঙ্গ আসে। শচীশ সেদিন এসে দামিনীকে তাদের থেকে দূরে কোনো আত্মীয়ের কাছে চলে যাওয়ার ব্যাবস্থা করে দেওয়ার কথা জানালে, দামিনী তার দামিনিসুলভ দাপটে শচীশকে জবাব দেয়, শেষে অবশ্য কেঁদে দরজা বন্ধ করে। বাদানুবাদের পর শচীশ সেদিন আর কীর্তন শুনতে ফিরে গেল না। এরপর শচীশ নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে একা ভ্রমণে যায়। ফিরে এসে দামিনীকে আবার নিজেদের কাছে দামিনীকে যুক্ত করে। পাথর গলে যায়, দামিনী কীর্তনের আসরে নিয়মিত উপস্থিত হয়। দামিনীর আত্মসমর্পনে এবার দামিনী শচীশের চোখে সত্য হয়ে ওঠে, স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গানের পদ, তত্ত্বের উপদেশ ঠেলে দামিনী প্রতিভাত হয়।

এখন দামিনী গানগুলিকে সাজায় না, গানগুলিই দামিনীকে সাজাইয়া তোলে।

শ্রীবিলাসের কাছে কেবল এসব গানবাজনা বিশ্রী রকমের বিস্বাদ হয়ে যায়। এরপর নবীনের স্ত্রীর আত্মহত্যা। লীলানন্দ স্বামীর সঙ্গ তারা ত্যাগ করল।

গুরুজির কাছে অনেক শিষ্য জুটিল, তারা তাঁকে কীর্তন শুনাইতে লাগিল- তিনি কীর্তনে যোগ দিয়া নাচিতে লাগিলেন। 'জ্যাঠামশায়' অধ্যায়ে গানের কোন উপস্থিতি ছিল না। 'শচীশ' অধ্যায়ে আধুনিক কবির গানের মাধ্যমে, লীলানন্দ স্বামী কিছুক্ষণের জন্য সবাইকে এক শান্ত মধুরলোকে নিয়ে গিয়েছিলেন। 'দামিনী' অধ্যায়ে কীর্তন শচীশ ও দামিনীর টানাপোড়েনের যেন পটভূমি। 'শ্রীবিলাস' অধ্যায়ে গানের প্রসঙ্গগুলি একদিকে দার্শনিক তত্ত্বের কথা বলে, অন্যদিকে প্রানবন্ত জীবনের কথা বলে। 'শ্রীবিলাস' অধ্যায়ের তিন পর্বে ভূতুড়ে বাড়িতে বসবাসের সময় একদিন রাতে শচীশ, দামিনী শ্রীবিলাস চাতালে বসে ছিল। শচীশের তার সাধনার উপলব্ধির কথা বলে।

দামিনী, বুঝিতে পারিতেছ না? গান যে করে সে আনন্দের দিক হইতে রাগিণীর দিকে যায়, গান যে শোনে সে রাগিণীর দিক হইতে আনন্দের দিকে যায়। একজন আসে মুক্তি হইতে বন্ধনে, আর-এক জন যায় বন্ধন হইতে মুক্তিতে, তবে তো দুই পক্ষের মিল হয়।তিনি যে গাহিতেছেন আর আমরা যে শুনিতেছি। তিনি বাঁধিতে বাঁধিতে শোনান, আমরা খুলিতে খুলিতে শুনি।

রূপ থেকে অরূপের পথে, এবং অরূপ থেকে রূপের দিকে যাত্রাকে এইভাবেই সহজভাবে বোঝান হয়। চতুরঙ্গ উপন্যাসের ব্যাঞ্জনা যেন কিছুটা উন্মুক্ত হয়। শচীশ গানের রাগিণী ও আনন্দ এই দুইয়ের মাধ্যমে যেন একটা পথের সন্ধান করে নিতে পারে। শ্রীবিলাসের জীবনের সুর নতুন তারে নতুন সুরে বাঁধা হয়। বিধাতা তাঁর বাহাদুরি দেখাইলেন বটে! এই ইঁটকাঠগুলোকে তিনি তাঁর গানের সুর করিয়া তুলিলেন। কলকাতা শহর শ্রীবিলাসের কাছে হয়ে উঠল বৃন্দাবন। নিত্যদিনের খাটুনিটা হয়ে উঠল বঁশির তান। চতুরঙ্গ উপন্যাস কাহিনি আকারে যেন নিজেই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গান হয়ে উঠেছে। যে উপন্যাসে শেষ পর্যন্ত বেদনার সুর প্রাধান্য পেয়েছে। মধুরতম গান তো সেই গান যেখানে বেদনার গল্প লেখা থাকে। শঙ্খ ঘোষ তাঁর 'দামিনীর গান' রচনাটিতে- মেঘ বলেছে 'যাব যাব', রাত বলেছে 'যাই' গানটিকে দামিনীর জীবনের সঙ্গে তুলনীয় বলে মনে করেছেন। তিনি বলেছেন ''দুঃখের সেই ঐশ্বর্য ছাড়া সে কি ছুঁতে পারত এই জীবন?

এমনি এক অনুভবের সামনে এসে দামিনী দেখে তার জীবনকে, তার মৃত্যুকে। এমনি এক অনুভবের সামনে এসে 'মেঘ বলেছে যাব যাব' র মতো কোনো গান হয়ে ওঠে যেন দামিনীর গান, দামিনীকে ঘিরে রাখা গান'.১০

চতুরঙ্গ উপন্যাসে ভাষা

চতুরঙ্গ উপন্যাসের কাহিনি আকারে, বিস্তারে সংক্ষিপ্ত। অথচ উপন্যাসটিতে বিষয় ও চরিত্রের গভীরতা, ব্যাপ্তি অসামান্য । ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমস্ত মুন্সিয়ানা ভাষা প্রয়োগে উজাড় করে দিয়েছেন। ভাষার ব্যাঞ্জনা উন্মোচন করেই এই উপন্যাসটিকে অনুধাবন করতে হয়। উপমা, চিত্রকল্পের প্রয়োগে অল্প কথায় অধিক অর্থ প্রকাশিত হয়েছে। আগুন, ফুল, সমুদ্রের নানা চিত্রকল্প একাধিকবার উপস্থিত হয়েছে। আগুনের কথা এভাবে পাওয়া যায়- শচীশের বাহ্যিক বর্ণনায়। শচীশ যেন জ্যোতিষ্ক, তার চোখ জ্বলছে। তার আঙুলের সঙ্গে আগুনের শিখার তুলনা করা হয়েছে। জ্যাঠামশায়ের শিষ্য শচীশের চরিত্রের দীপ্তি এভাবেই আগুনের নানারূপের সঙ্গে তুলনীয় হয়েছে। মুসলমান ব্যাপারী ও চামারদের নিয়ে জগমোহন ও শচীশের হিতানুষ্ঠানে তীব্র আপত্তি ছিল হরিমোহনের। হরিমোহনের ফোঁটাতিলক আগুনের শিখার মতো জ্বলিয়া মগজের মধ্যে লঙ্কাকাণ্ড ঘটাইবার জো করিল।

হরিমোহন ও তাঁর দাদার সম্পর্কের মাত্রা বোঝাতে এই চিত্রকল্পের প্রয়োগই যথেষ্ট। পুরন্দর চরিত্রের হীনতা ব্যাক্ত হয় আগুনের উল্লেখেই। চামারদের বাড়ি থেকে তাড়াতে না পারায় তার মনে আগুন জ্বলছিল। জ্যাঠামশায়ের বাড়িতে ননীকে দেখেও পুরন্দরের মনে ঈর্ষার আগুন জ্বলে উঠেছিল। শচীশ যখন ননিবালাকে নিয়ে আসে জগমোহনের কাছে, সব ঘটনা জানার পর জগমোহনের মানসিক অবস্থা বোঝাতে আগুনের চিত্রকল্প – জগমোহন তো একেবারে আগুন পারলে তৎক্ষণাৎ অপরাধী পুরুষটিকে শাস্তি দেন। দামিনী আর শচীশের সম্পর্কের দোলাচলে আগুনের চিত্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। দামিনীর উপস্থিতি শচীশের মনকে অস্থির করছে, শচীশ নিজের মনের একাগ্রতা রক্ষা করার তাগিদে দামিনীর কাছে যখন জানতে চায় সে ভক্তদের মধ্যে আছে কেন, কথায় উত্তর দেওয়ার আগে দামিনীর চোখ কথা বলে ওঠে। দামিনীর দুই চোখ যেন দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। আবার শচীশ তাকে ফিরে আসার অনুরোধ করার পর দামিনী নিজেকে নরম করে। পাথর আবার গলিল। দামিনীর যে অসহ্য দীপ্তি ছিল তার আলোটুকু রহিল, তাপ রহিল না। এক বজ্র বিদ্যুতের রাতে শচীশ দামিনীর কাছ থেকে মুক্তি চায়। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে লেখা একটি গান- কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো/ বিরহানলে জ্বালো রে তারে জ্বালো। আবারও দামিনীর সঙ্গে একাকার হয়ে যেতে চায়। কলকাতায় ফেরার পথে দামিনীর মধ্যে প্রলয়ের আগুন জ্বলছিল।সেই আগুনের উত্তাপে তপ্ত হচ্ছিল শ্রীবিলাস। আগুনের তীব্র উত্তাপ, স্নিগ্ধ দীপ্তি চরিত্রগুলির মধ্যে নানাভাবে প্রতিভাত।

চতুরঙ্গ উপন্যাসে ফুলের উপমা, চিত্রকল্পের ভূমিকা আছে। ননিবালার চরিত্রের সঙ্গে শিরীষ ফুলের তুলনা করা হয়েছে। জগমোহনের সংলাপে নয়, কিন্তু জগমোহনের মনের কথা এভাবেই ব্যাক্ত শ্রীবিলাসের বয়ানে-ফুলের উপরে ধুলা লাগিলেও যেমন তার আন্তরিক শুচিতা দূর হয় না তেমনি এই শিরীষ-ফুলের মতো মেয়েটির ভিতরকার পবিত্রতার লাবণ্য তো ঘোচে নাই। তার দুই চোখের মধ্যে আহত হরিণীর মতো ভয়, তার সমস্ত দেহলতাটির মধ্যে লজ্জার সংকোচ, কিন্তু এই সরল সকরুণতার মধ্যে কালিমা তো নেই। জ্যাঠামশায় অধ্যায়ের পাঁচ পর্বে ননিবালার চরিত্র এভাবেই উপস্থাপিত হয়েছে। শিরীষ ফুলের কোমলতা, আহত হরিণীর ভয়, ননিবালাকে বুঝতে সাহায্য করে। দামিনী সম্পর্কে নানাভাবে ফুলের উল্লেখ আছে। দামিনীর উপস্থিতি যখন আড়াল থেকে জানা যেত তখন ফুলের ছিন্ন পাপড়ির মতো জীবনের ছোট ছোট পরিচয় তাদের স্পর্শ করে যেত। দামিনী বসন্তের পুষ্পবনের মতো লাবণ্যে গন্ধে হিল্লোলে পরিপূর্ণ। এরপর গুরুর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা দামিনী বিদ্রোহিণী রূপ ছেড়ে নত হল,-'শচীশ' অধ্যায়ের সাত পর্বে আত্মোৎসর্গের ফুলটি উপরের দিকে শিশিরভরা মুখটি তুলিয়া ধরিল। 'শ্রীবিলাস' অধ্যায়ের শেষে পারিজাত ফুলের কথা আছে। দামিনীকে জীবনে পাওয়ার আনন্দে শ্রীবিলাসের কলকাতা শহরকেই নন্দনকানন বলে মনে হয়েছিল। এই অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল দামিনীকে দাহ করে শ্রীবিলাস দেশে ফিরে আসার আগে এক জায়গায় কিছুদিন ছিল। উপন্যাসের এই অংশটি শ্রীবিলাসকে বুঝে নেওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। রথীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণ থেকে আমরা জানতে পারি শ্রীবিলাস অংশটি রবীন্দ্রনাথ পাঠ করেছিলেন। লেখাটি শিলাইদয়ের গন্ধে পরিপূর্ণ। ভাঙা নীলকুঠির পাশে নদী,নির্জন গ্রাম। ফাল্গুনের শেষে এই জায়গায় ভাঁটফুল, আকন্দ গাছ ফুলে ভরে আছে। দখিনা বাতাসে তাদের লুটোপুটিতে হাসি দেখেছে শ্রীবিলাস। জীবনের প্রতি শ্রীবিলাসের বিতৃষ্ণা জন্মায় নি, আমি যখন সকালবেলায় শেতলা-পড়া ইটের ঢিবির উপর বসিয়া থাকি তখন ধোনেফুলের গন্ধে আমার মগজ ভরিয়া যায়। পারিজাত ফুলের পর অতি তুচ্ছ ধনে ফুলের গন্ধ-এই বৈপরীত্য জীবনের উত্থান-পতনের ছবি তুলে ধরে। এছাড়াও ঢেউ, নদী, ঝড়ের পটভূমি চরিত্রগুলির মনোভাব বোঝাতে সহায়ক হয়েছে। শ্রীবিলাস যে নিজেকে অগোচরে রেখে সবার কথা বলে গেছে তার মনের রং, আনন্দ, পুলক প্রাকাশ পেয়েছে কয়েকটি ছবিতে। দামিনী যখন শ্রীবিলাসের বিবাহপ্রস্তাব হেসে পাগলামি বলে উড়িয়ে দিতে চাইছে- পাগলামি আরব্য উপন্যাসের সেই জুতা, যা পায়ে দিলে সংসারের হাজার হাজার বাজে কথাগুলো একেবারে ডিঙাইয়া যাওয়া যায়। কথা অল্প, ভাব অসীম। শ্রীবিলাস অসাধ্যকে এইভাবেই বাস্তবে সাধন করে। দামিনী শ্রীবিলাসের মুখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হলে শ্রীবিলাসের ভয়ানক অস্বস্তি হয়। দামিনী কহিল, বিধাতার ওই সৃষ্টিটা যে সুদৃশ্য, আমি সেইটেই আবিষ্কার করিতেছি। আমি কহিলাম, ইতিহাসে তোমার নাম থাকিবে। উত্তর-মেরুর মাঝখানটাতে যে দুঃসাহসিক আপনার নিশান গড়িবে তার কীর্তিও এর কাছে তুচ্ছ ।

চতুরঙ্গ উপন্যাস তার ভাষার ব্যাঞ্জনায় অনন্য। সংক্ষিপ্ত শুধুমাত্র আকারে আয়তনে। চতুরঙ্গ না ফোটা ফুলের কুঁড়ির মতো। বারংবার পাঠের মাধ্যমে ফুলের মতো ফুটে ওঠে পাঠকের অন্তরে। ধর্মচর্চার অসার দিকটি নানা ব্যাঞ্জনায় ব্যাক্ত হয়েছে। বন্ধন-মুক্তি পার্থিব-অপার্থিব, এই দর্শন নানা রূপে, রূপকে পাঠকের মনকে আকর্ষণ করেছে। এই উপন্যাস পুরনো হয় না। প্রত্যেক নতুন পাঠে পাঠকের অগোচরে থেকে যাওয়া কোন একটি দিককে আবার নতুন করে দেখতে সাহায্য করে।

References

1. রবীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড ৯, পশ্চিমবঙ্গ বাঙলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৪, পৃ ৩৪৯
2. পিতৃস্মৃতি, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জিজ্ঞাসা পাবলিকেশন, কলিকাতা, ১৩৭৩, পৃ ২৪৫
3. রবীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড ৯, পশ্চিমবঙ্গ বাঙলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৪, পৃ ৩৫০
4. তদেব, পৃ ৩৬৭
5. তদেব, পৃ ৩৬৬

6. রবীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড ১৬ পশ্চিমবঙ্গ বাঙলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৬, পৃ ৬৩৭
7. রবীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড ৯, পশ্চিমবঙ্গ বাঙলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৪, পৃ ৩৯৫
8. তদেব, পৃ ৩৬৯
9. তদেব, পৃ ৩৭৮
10. দামিনীর গান, শঙ্খ ঘোষ, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৪০৯, পৃ ৬৬